উজান স্রোত

বাংলা থেকে ইংল্যান্ড ইতিহাসের নীরব স্রোত

এ.এন.এম. নুরুল হক

ঐতিহ্য

উইনস্টন চার্চিল ও
ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম অমানবিকতায়
ছিয়াত্তর ও পঞ্চাশের মন্বন্তর নামক গণহত্যায় প্রাণ হারানো
আশি লক্ষ বাঙালির বিদেহী আত্মার প্রতি

আভাষ

উজান স্রোত— এই স্রোত সময়ের গতিপথে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে প্রবাহিত ইতিহাসের এক নীরব স্রোত, যে স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ব্রিটিশ জাতির হাজার বছরের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা ও অহংকার। দুর্ধর্ষ লুটেরা রবার্ট ক্লাইভ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হীন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পলাশির যুদ্ধ জিতে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে– এইটুকু গল্প শুনে আজও এদেশের স্কুলের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। কিন্তু এই ইংরেজ শাসনামলে ওদের দুঃশাসন ও চরম অমানবিকতায় বাংলার বুকে কতো যে হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে, সেসব আজ ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়। এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসই ভুলতে বসেছে, আর সেসব ঘটনা তো আরও আগের। ব্যবসা করতে এসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে এদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে। এদেশের মানুষের কাছে এই নামটি পরিণত হয় জাজ্বল্যমান বিভীষিকায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার বিপুল পরিমাণ সম্পদ লুঠ করে ব্রিটেনে নিয়ে যায়। এই লুঠতরাজের পরিমাণ এতোটাই বিশাল ছিল যে, ব্রিটিশরা বাংলা শব্দ ‘লুঠ’ তাদের ডিকশনারিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পলাশির পরাজয়ের পর বাংলার সমুদয় সম্পদ বিভিন্নভাবে ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ঐতিহাসিকগণ এই লুণ্ঠনকে 'Plassey Plunder' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। বাংলা থেকে লুণ্ঠিত এই বিপুল অর্থই ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের পটভূমি রচনা করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মন্তুদ দুটি ঘটনা হলো বাংলার মন্বন্তর। ইংরেজি ১৭৭০ সাল তথা বাংলা ১১৭৬ সনে বাংলা ও বিহারে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, ইতিহাসে তা ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে পরিচিত। এতোবড় একটা দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক কারণে ফসলহানির জন্য ঘটেনি, ঘটেছিল মানুষের কারণে। কালোবাজারিদের কারসাজিতে ভেলকিবাজির মতো হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় সব খাদ্যশস্য। খোলাবাজারের খাদ্যশস্য স্থান লাভ করে কালোবাজারে। কালোবাজার থেকে তিন-চার গুণ বেশি দামে খাবার কেনার ক্ষমতা ছিল না দরিদ্র জনগণের। পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনের পর দিন অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে মারা গিয়েছিল বাংলা ও বিহারের ৪০ লাখ মানুষ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ১৭৩ বছর পর ইংরেজি ১৯৪৩ সাল তথা বাংলা ১৩৫০ সনে বাংলায় আবারও এক প্রলয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হানা দিয়েছিল। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সব দায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নির্দোষ থাকার চেষ্টা করে কুচক্রী ইংরেজ সরকার। এই যুদ্ধে বাংলার মানুষ কোনো দেশেরই শত্রু বা মিত্র ছিল না। বাংলার মাটিতে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবু বাংলার লাখ লাখ মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সুচতুর উইনস্টন চার্চিল নিজেদের যুদ্ধের দুই-তৃতীয়াংশই ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। চার্চিল বাংলার অভুক্ত মানুষের খাদ্যসম্ভার ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও তাদের বেসামরিক লোকদের জন্য মজুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাংলায় যখন অনাহারে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছিল, তখন এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা টেলিগ্রামের মাধ্যমে চার্চিলকে জানানো হলে শ্লেষের সাথে তিনি বলেছিলেন, তাহলে গান্ধী এখনও মরেনি কেনো? চার্চিলের হীনম্মন্যতার এটিই একটি বড় পরিচয়। পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিল চার্চিল-এর সুপরিকল্পিত এক গণহত্যা। মন্বন্তর নামক এই গণহত্যায় প্রাণ হারানো চল্লিশ লাখ বাঙালির চিরস্থায়ী অভিশাপ পরজীবনে ভোগ করতে হবে চার্চিলকে।

উজান স্রোত— ইতিহাসের এই নীরব স্রোত এখন বইছে উজান পথে। বাংলার বুকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুশো বছরের রক্তাক্ত শাসন, অবাধে লুণ্ঠতরাজ এবং চার্চিলের ষড়যন্ত্রে বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর নামক গণহত্যার সূচনা হয়– সময় এসেছে এসকল বিস্মৃত ইতিহাস নতুন করে চর্চার। ব্রিটিশ জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও অশ্বেতাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী উজান স্রোতের এক বেগবান ধারা। দুশো বছর ধরে শোষণ ও লুটপাট চালিয়ে ব্রিটিশরা ৭৬ বছর আগে এদেশ ছেড়ে চলে গেলেও ওদের প্রেতাত্মা আজও চেপে আছে এদেশের মানুষের ঘাড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এর একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ভাওয়ালের রাজকুমারদের অর্থানুকূল্যে এই দৃষ্টিনন্দন ভবনটি নির্মিত হয়েছিল টাউন হল হিসেবে। সমগ্র বাঙালি যখন একজোট হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন সেই ঐক্যে ফাটল সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যে সুচতুর কার্জন বঙ্গভঙ্গ নামক এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল। ব্রিটিশ দাসত্বের স্মারক হিসেবে বাঙালি বিদ্বেষী কার্জনের নাম আজও ধারণ করে আছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা। রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও হার্ডিঞ্জ ব্রিজ– এগুলোও তো এদেশের মানুষের ব্রিটিশ দাসত্বের স্মারক।

সাহিত্যের সুললিত ভাষায় রচিত বইটিতে যেমন রয়েছে ইতিহাসের অনেক অজানা ঘটনা, তেমনি রয়েছে কিছু ঐতিহাসিক প্রেম কাহিনি, যা বইটিকে করেছে সুখপাঠ্য।

বিষয় সূচি

অন্য রকম এক মেয়ে ১১
বিলেতি বাংলাদেশি ২০
অতীতের ব্রিটিশ জাতি ৩১
রাজাকাহিনি ৫০
নতুন যুগে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র ৬১
অষ্টম হেনরি ও অ্যান বোলিন ৭৩
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৮৩
কোম্পানি থেকে শাসক : এক রক্তাক্ত অধ্যায় ৯৭
দুর্ধর্ষ লুটেরা রবার্ট ক্লাইভ ১১৯
বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ ১২৯
বাংলার মন্বন্তর ও চার্চিলের ষড়যন্ত্র ১৩৯
ভারত বিভাজনের নেপথ্যের এক প্রণয়কাহিনি ১৫৬
ব্রিটেনের রাজনীতিতে বাংলাদেশিরা ১৬৩
উজান স্রোতের কান্ডারি ১৬৭

অন্য রকম এক মেয়ে

মেয়েটি শৈশব থেকেই অন্য রকম। আর দশটা মেয়ের মতো নয় সে। চঞ্চল ও কিছুটা দুরন্ত প্রকৃতির। রঙিন প্রজাপতির মতো সারা দিন উড়ে বেড়ায় পাড়ায় পাড়ায়। পাড়াপড়শিরা সবাই তার পাড়া সম্পর্কের আত্মীয়। কেউ চাচা, কেউ খালা। কেউ দাদি আর কেউবা ফুফু। ফুলের মতো ফুটফুটে এই মেয়েটিকে পাড়াপড়শিরাও খুব ভালোবাসে। আদর করে ঘরে নিয়ে বসায়। খেতে দেয় এটা-সেটা। জেসি নামের এই মেয়েটির মুখজুড়ে সব সময় ছড়িয়ে থাকে একটা মধুর হাসি। ওর বয়সী পড়শি মেয়েরা যখন পুতুল খেলায় মেতে থাকে কিংবা বাড়ির আঙিনায় খেলে এক্কাদোক্কা, জেসি তখন মেতে থাকে অন্য রকম খেলায়। ওদের বাড়ির আঙিনার ছোট্ট বাগানে আছে কয়েক রকমের গোলাপ, জবা, জুঁই, রঙ্গন আর কাঁঠালচাঁপার গাছ। সারা বছরই কোনো না কোনো ফুল ফোটে এসব গাছে। যেখানে ফুল সেখানেই প্রজাপতি আর যেখানে প্রজাপতি সেখানেই জেসি। এই প্রজাপতিগুলোই জেসির বন্ধু, খেলার সাথি।

রাতে ঘুমানোর আগে জেসির গল্প শোনা চাই-ই চাই। এক যে ছিল রাজা, তার ছিল এক রানি, রূপকথার এসব রাজা-রানি, বন্দি রাজকুমারী, রাক্ষস-খোক্কস, উত্তেজনা ও মনে রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দেওয়া এসব গল্প শোনার প্রতি বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই মেয়েটির। তার আগ্রহ জীবনের সত্যি গল্প শোনার প্রতি। একটা সময় ছিল, যখন বিলেতের লালমুখো সাহেবরা এ দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তুচ্ছ কারণে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পিটিয়ে এ দেশের নিরীহ মানুষের পিঠের চামড়া তুলে নিত তারা। এসব নির্মম সত্যি ঘটনার গল্প শোনার আগ্রহী ছোট্ট মেয়ে জেসি।

সিলেট জেলার এক বনেদি পরিবারে জন্ম নেওয়া এই মেয়েটির পুরো নাম জেসমিন খান জেসি। সে এখন স্কুলে পড়ে। স্কুলেও সে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রথম সারিতে। সিলেটের সংস্কারমুক্ত ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা মেয়ে জেসি স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে অভিনয় ও আবৃত্তিতে বরাবরই কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। ক্রীড়াঙ্গনেও তার সদর্প উপস্থিতি। দৌড়, হাইজাম্প, লংজাম্প, বর্শা নিক্ষেপ– সব ইভেন্টেই জেসির জয়জয়কার। জেসমিন খান জেসি এখন নবম শ্রেণির ছাত্রী। ইতিহাসের প্রতি তার মনে প্রবল আগ্রহ। টিফিন পিরিয়ডে অন্য ছাত্রছাত্রীরা যখন স্কুলের মাঠে খেলাধুলোয় মেতে ওঠে, জেসি তখন স্কুলের লাইব্রেরিতে মগ্ন হয়ে ইতিহাসের বই পড়ে। ইতিহাসের প্রতি তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এ দেশে শাসনের নামে ইংরেজদের শোষণ ও নিপীড়ন।

দীনবন্ধু মিত্রের লেখা ‘নীলদর্পণ’ নাটকটি পড়ার পর থেকে এ দেশে নীল চাষের ইতিহাস ও ইংরেজ নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের কাহিনি জানতে খুবই আগ্রহী হয়ে পড়ে জেসি। ইতিহাস ঘেঁটে সে জানতে পারে, লুইস বোনার্ড নামের এক নীলকর ১৭৭৭ সালে বাংলায় প্রথম নীল চাষ শুরু করে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের ফলে সেখানকার বস্ত্রশিল্পে নীলের চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। বাংলায় ব্রিটিশ কর্তৃত্ব সম্প্রসারণের সাথে সাথে নীল চাষের এলাকা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ এলাকা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের অনেক স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে। কুষ্টিয়া, যশোর, বগুড়া ও রংপুরে নীলকুঠি স্থাপন করে ইংরেজ নীলকররা জোরজুলুম করে কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করে। অবাধ্য কৃষকদের ওপর ব্রিটিশ নীলকররা শুরু করে নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়ন। কৃষকদের যুবতী স্ত্রী ও কন্যাদের ধরে এনে নীলকুঠিতে দিনের পর দিন আটকে রেখে ধর্ষণ করা হতো।

বাংলায় নীল চাষে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হচ্ছে দেখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নীলকরদের ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান শুরু করে। বাংলা অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ নীল রপ্তানি ব্রিটেনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ১৮১৫ সালের মধ্যে যশোর, খুলনা, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ জেলায় অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপন করে এ সকল স্থানের কৃষকদের ধান ও পাট চাষের জমিতে নীল চাষে বাধ্য করা হয়। যশোরের নহাটা ও

কালনাতে নীলকুঠি ও নীল উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করা হয়। এ সময় বাংলাদেশের প্রায় ২০ লাখ ৪০ হাজার বিঘা জমিতে নীল চাষ করে ১২ লাখ ৮০ হাজার মণ নীল উৎপন্ন হতো। প্রায় ১ কোটি ১২ লাখ কৃষক বাধ্য হয়ে নীল চাষে নিয়োজিত হয়। এ সময় বাংলায় ১১৬টি কোম্পানি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ৬২৮টি সদর কুঠির অধীনে ৭ হাজার ৪৫২টি নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূলধনের ৭৩ ভাগ নীলের কারবারে লগ্নিকৃত ছিল।

বাংলার কৃষকদের জোরজুলুম করে নীল চাষে নিয়োজিত করার একপর্যায়ে কৃষকগণ নীল চাষ করতে অস্বীকার করেন এবং ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ১৮৫৯ সালে শুরু হওয়া এই কৃষক বিদ্রোহ সমগ্র বাংলায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল, অর্ধশতাব্দী ধরে ইংরেজ নীলকরদের নীলচাষিদের ওপর নির্মম অত্যাচার, নিপীড়ন এবং নীল চাষ বাধ্যবাধকতামূলক আইন প্রণয়ন। মণ্ডল নামে পরিচিত গ্রামপ্রধান এবং প্রভাবশালী কৃষকগণ এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বিদ্রোহী কৃষকদের ওপর নীলকরদের ভয়ানক নির্যাতন ও গ্রেপ্তার শুরু হলে এই আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়। নীল বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার ১৮৬০ সালে 'নীল কমিশন' গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে নীল চাষে বাধ্যবাধকতা আইনটি বাতিল করা হলে এক বছর ধরে চলা এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

নীল বিদ্রোহের একটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা জেনে কিশোরী জেসির মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ঘটনাস্থল বর্তমান বাগেরহাট জেলার সর্ববৃহৎ উপজেলা মোরেলগঞ্জ। রবার্ট মোরেল নামের এক ইংরেজ সেখানে নীলকুঠি স্থাপন করে নীল চাষ শুরু করে। এই মোরেল সাহেবের নামানুসারে স্থানটির নাম হয় মোরেলগঞ্জ। কৃষক বিদ্রোহের এক নির্মম ও রক্তাক্ত অধ্যায় রচিত হয়েছিল এই মোরেলগঞ্জে। মোরেলগঞ্জে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন রহিমুল্লাহ নামের একজন সাহসী তরুণ ও সম্পন্ন কৃষক। বাবার বাড়ি থেকে পালকিতে কুঠিবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে রহিমুল্লাহর স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে ফেরার পথে রবার্ট মোরেলের তরুণ পুত্ররা পালকি আটক করে। পালকি থেকে রহিমুল্লার স্ত্রীকে রবার্ট মোরেলের পুত্ররা টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে কুঠিবাড়িতে নিয়ে যায় এবং তাকে তারা উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। এই সংবাদ রহিমুল্লার কানে পৌঁছার সাথে সাথে তিনি তার কিছুসংখ্যক সঙ্গী-সাথি নিয়ে কুঠিবাড়ি আক্রমণ করেন।

বীরত্বের সাথে মোরেল পরিবার ও তাদের লাঠিয়ালদের সাথে লড়াই করে বন্দুকের গুলিতে নিহত হন রহিমুল্লাহ। তবে এই ঘটনার জের ধরে মোরেলগঞ্জ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে হয় মোরেল পরিবারকে। মোরেলরা চলে গেলেও তাদের কলঙ্কময় নাম যুগের পর যুগ ধরে বক্ষে ধারণ করে আছে উপজেলা মোরেলগঞ্জ। অথচ বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে রহিমুল্লার নাম। এরই নাম কি তাহলে ইতিহাস? এই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা বুকের ভেতর তোলপাড় করে কিশোরী মেয়েটির।

সুসভ্য বলে খ্যাত ইংরেজ জাতির মধ্যে যে এত দুরাত্মা, এত পাষণ্ড রয়েছে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি এই কিশোরী মেয়েটি। বাংলায় নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের গল্পের যেন কোনো শেষ নেই। জেসির মনে হয়, সমগ্র বিশ্বে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার ইতিহাসে বাংলার ইংরেজ নীলকররাই শীর্ষ স্থান অধিকার করে ছিল তৎকালে। তারা কৃষকদের ধানি জমিতে জোর করে নীল চাষ করতে বাধ্য করত। অবাধ্য হলে তাদের অমানুষিক অত্যাচার করা যেন নীলকরদের জন্মগত অধিকারে পরিণত হয়েছিল মগের মুল্লুক বাংলাদেশে। ধানি ফসলের জমিতে নীল চাষ করতে গিয়ে দারিদ্র্যের এক মহা দুষ্টচক্রে বছরের পর বছর নিষ্পেষিত হতে হয়েছে বাংলার নীলচাষিদের। অবশেষে এক সর্বাত্মক সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে চাষিরাই বাংলায় নীল চাষের অবসান ঘটায়।

ইতিহাস বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় এসে নিবদ্ধ হয় জেসির চঞ্চল চোখের দৃষ্টি। ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের নাম অমৃতসরে গণহত্যা। এই ভয়ংকর দিনটি ছিল ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল। সেদিন ভারতের অমৃতসরে কয়েক হাজার মানুষ ব্রিটিশদের দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নেয়। শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ মিছিল শেষে বিক্ষোভকারীরা সমাবেশ করার জন্য চারদিক থেকে উঁচু প্রাচীরঘেরা জালিয়ানওয়ালা পার্কে প্রবেশ করলে পার্কের মূল প্রবেশপথ সেনাবাহিনী বন্ধ করে দেয়। তারপর ব্রিটিশ ব্রিগেডিয়ার রেজিনাল ডায়ারের নির্দেশে সেনাবাহিনী অবরুদ্ধ জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। দশ মিনিট যাবৎ চলে গুলির এই চরম নিষ্ঠুর তাণ্ডব। ব্রিটিশ সরকারের হিসাবে এই ঘটনায় ৩৭৯ জন নারী-পুরুষ নিহত হয়। কিন্তু বেসরকারি হিসাবে নিহতের সংখ্যা হাজারের বেশি। এ ছাড়া গুলিতে মারাত্মক আহত হয়েছিলেন